অরোরার আঙুল

কাজী রাফি

অরোরার আঙুল

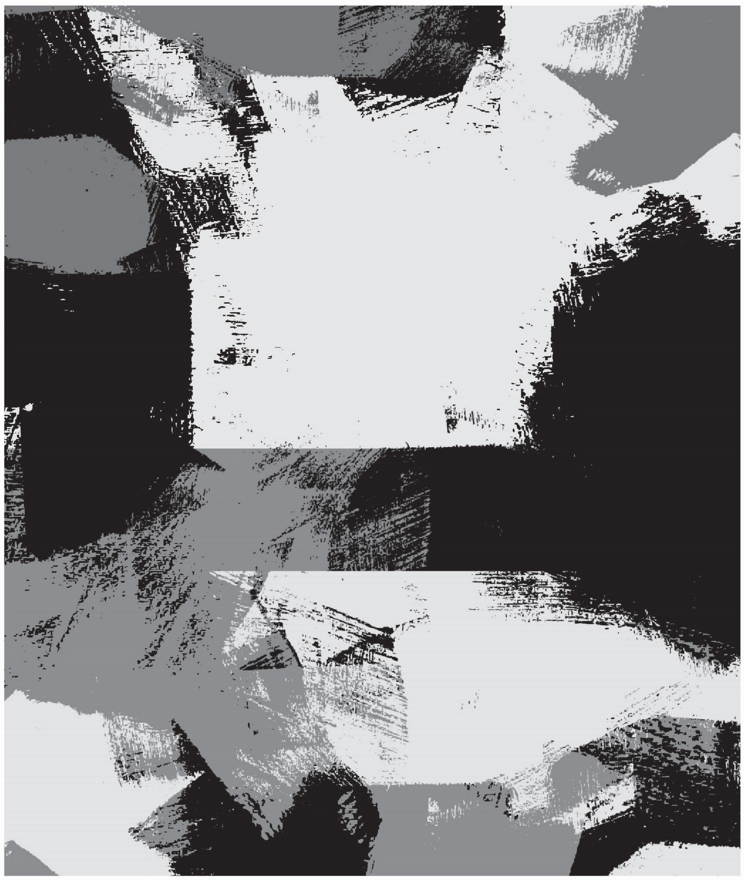

অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Arorar Angul by **Kazi Raf**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2024

Price : 400.00
US $ 10

ISBN 978 984 98478 2 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
www.anindyaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১১৯৬৬৬
www.rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.othoba.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
www.boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash/ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২
www.prothoma.com/anindyaprokash/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

তিনি আমার সব সৃষ্টির একনিষ্ঠ পাঠক, আমার শুভাকাঙ্খি,
শ্রদ্ধাভাজন। তিনি আমার আপনার চেয়েও বড়ো আপনজন-
মঈন আহমেদ
কাজী রাফিকে নিয়ে স্বপ্ন যার অফুরান!

লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ :

১) ধূসর স্বপ্নের সাসান্দ্রা – অনিন্দ্য প্রকাশ
২) ত্রিমোহিনী – পার্ল পাবলিকেশন্স
৩) লে জোঁ নদীর বাঁকে – পার্ল পাবলিকেশন্স
৪) আঁধারে লুকানো সুর – পার্ল পাবলিকেশন্স
৫) রংধনুর সাঁকো – অনিন্দ্য প্রকাশ
৬) নোরার ক্যাসল অব কাসাব্ল্যাঙ্কা – অন্বেষা প্রকাশনী
৭) নিসর্গে নিরুদ্ধ – অনিন্দ্য প্রকাশ
৮) ছায়ার নির্বাসন নির্বাসনের ছায়া – অনিন্দ্য প্রকাশ
৯) গ্রামটির নাম গোধূলিমায়া – সময় প্রকাশনী
১০) অনেক বৃষ্টির একটি কদম – বিদ্যাপ্রকাশ

গল্প গ্রন্থসমূহ :
১) রূপডাঙ্গার সন্ধানে – অনিন্দ্য প্রকাশ
২) পাসওয়ার্ড – অনিন্দ্য প্রকাশ
৩) আটলান্টিকের পড়ন্ত বিকেল – সময় প্রকাশনী
৪) নিঃসঙ্গতার নগ্ন খোলস – অনিন্দ্য প্রকাশ
৫) বৃষ্টিরাতের অভিসারিণী – পার্ল পাবলিকেশন্স
৬) আবির রাঙা এক প্রজাপতি– বিদ্যাপ্রকাশ

প্রবন্ধ :
তরুণ সমাজের মুক্তির আলো – পার্ল পাবলিকেশন্স

কিশোর উপন্যাস :
রাজকুমারী মারিয়া এবং বৃদ্ধ নাবিক – অনিন্দ্য প্রকাশ

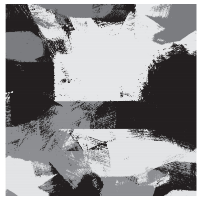

ঘুম থেকে জেগে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল অরিত্র। মাত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠা ভোরের আলোয় প্রশস্ত নির্জন রাস্তাটার মাথায় একটা কুকুর নিজের দুই পায়ের ভিতর মুখ গুঁজিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে আটলান্টিক সাগরের তট বরাবর। প্রতিদিন ভোরে এই রাস্তার পানে দৃষ্টি রেখে আনমনা হওয়া অরিত্রের প্রতিদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায় কোনো কারণে এই অভ্যাস চর্চিত না হলে অরিত্রের, 'কী যেন করা হয়নি'– এমন অনুভূতিতে দিনটাই খারাপ যায়।

জাতিসংঘের পশ্চিম আফ্রিকায় অর্থ-বিভাগে চাকরির কারণে তাকে যেদিন প্রথম মাতৃভূমি, বাবা-মা, প্রিয়জন ছেড়ে অজানার উদ্দেশে বিমানে উঠে বসতে হলো সেদিন অরিত্রের কেমন কান্না পাচ্ছিল। ভোরের জেগে ওঠার সাথে মাত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠা উদার নীলাকাশের নিচে এই নীরব আর শান্ত রাস্তাটি যেন তার আপনভূমি ছেড়ে আসার যে কষ্ট তার ভাষাটুকু জানে। রাস্তাটির দুই পাশের প্রতিটি একতলা বাড়ি দুই একরেরও অধিক জমিতে এক একটি আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাসাগুলোরই থোকা থোকা, গুচ্ছ গুচ্ছ আর রাশি রাশি বিচিত্র বর্ণের সব ফুল মোহনীয় অনন্যতায় ভরে রেখেছে রাস্তার চারপাশ।

ভোরের এই প্রকৃতি, ফুল, অবারিত নীলাকাশ আর কুকুরের শুয়ে থাকার অলস ভঙ্গিমা অরিত্রের জীবনস্মৃতিকে ধারণ করে তার মনোলোকে আছড়ে পড়ছে আটলান্টিক ঢেউ তরঙ্গের ছন্দ হয়ে। গাছের পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু জড়িয়ে আছে পরম মমতায়। এই মনোলোভা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে জীবনের গভীরতর অর্থ খুঁজে ফিরছিল সে। কিন্তু জীবনের অর্থ কিছুই পরিষ্কার না হলেও অরোরার একটা কথা স্পষ্টভাবে ওর কানে ভাসছে। পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু দেখিয়ে অরোরা একদিন অরিত্রকে বলেছিল,

ইউ নো অরিত্র, ডিউ অ্যান্ড দ্য মর্নিং ... অলওয়েজ গিভস মি অ্যা ফ্রেস ফিলিংস। দ্য বিউটি অব লাইফ।

অরিত্র অরোরার কথায় স্মিত হেসেছিল। আনমনা স্বরে বলেছিল,

অলসো দ্য ট্রুথ অব লাইফ। ওরা ক্ষণিক জীবন আর মিথ্যা মায়ার কথা বলে। মানুষের জীবন আসলে গোধূলিবেলার ছায়ার মতো, অন্তহীন গহিন এক আঁধারে হারিয়ে যাওয়ার জন্যই সে এই মায়াগুলোর ভিতরে আশ্রয় খুঁজে ফেরে।

অরিত্র আমার মতো করে ভাবো। জীবনের যেটুকু সময় তা কত মহান। এই মহান আটলান্টিকের দিকে তাকিয়ে একটা বিকেল কাটানোর মতো সৌভাগ্য দিয়েছেন যে স্রষ্টা– তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আড়মোড়া ভাঙল অরিত্র। অরোরার মাঝে কী এক জাদুশক্তি আছে যে ওর কথা মনে হলে সে একটু প্রাণশক্তি ফিরে পায়। আবিদজান ছাড়া আইভরি কোস্টের কোনো শহরকেই প্রকৃতি শহুরে স্বাধীনতা দেয়নি। নির্জন শহরের মাঝে প্রকৃতির বিলাসী প্রাচীনত্ব আর আর সদর্ভ অস্তিত্ব দেখে অরিত্রের ছোটোবেলায় দেখা বিটিভিতে 'মুভি অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে দেখা সাদা-কালো কোনো এক সিনেমার কথা মনে পড়ে–

এক সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে। দরজার বাইরে বিস্তৃত বাসাটায় অনেকগুলো প্রাচীন বৃক্ষ। বাসাটার সীমারেখার দেওয়ালগুলো ফুলে ফুলে ঢাকা। প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর বেদনা তার সমগ্র অভিব্যক্তিতে, সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। একটা কার পাতা মাড়িয়ে অতিক্রম করছে বাড়ির মূল দরজা। ছিমছাম, পাতাঝরা বাড়িটার দরজার লোহার গ্রিলগুলো খোলা। তরুণীটি তখনো তেমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তার হাতের লম্বা আঙুলগুলোতে যেন প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর অদ্ভুত এক কষ্টের ভাষা। ক্রমশ ক্যামেরা সরে যাচ্ছে লম্বা লম্বা গাছে। নির্জন শহরের গলিতে। পাতাগুলো ঝরছেই।...

নির্জন এই ভোরে নিভৃত এই পথটার দিকে তাকালে অরোরার কথা কেন মনে পড়ে– তা ভেবে আকুল হয় অরিত্র। অরোরার সাথে ছোট্টবেলায় দেখা সেই তরুণী নায়িকার অমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যকল্পের কোথায় সাদৃশ্য তা খুঁজে না পেয়েও কেন অরিত্রের বারবার অরোরাকে সেই নায়িকা ভেবে ভুল হয় তা সে অনেক ভেবেও আবিষ্কার করতে পারেনি।

পাশের বাসাতেই থাকে অরোরা। পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে অরোরা গ্রেড-২ লেভেলের (পি-২) কর্মকর্তা। তারই বিভাগে পি-৩ স্তরের অফিসার হয়ে আসার পর অরিত্র অবাক হয়েছিল। দেশ ছেড়ে এই আটলান্টিকের পাড়ে এসে সে যেন ছোটোবেলায় 'মুভি অব দ্য উইকে'র সেই ছলছলে গড়নের নায়িকাকে খুঁজে পেয়েছে। তার চেয়েও অরিত্র বেশি

অবাক হয় এই ভেবে যে, অরোরার আঙুলগুলোতেও সেই নায়িকার মতো 'অপেক্ষা' নামের শব্দটির এত অস্তিত্বময়তা! যতবার সে অরোরার লম্বা সুন্দর আঙুলগুলোতে দৃষ্টি ফেলে ততবার ছোটোবেলায় নাসারন্ধ্রে লেগে থাকা এক গন্ধ, হৃদয়ের মাঝে লুকানো গহিন-গোপন এক অনুভব আর স্বপ্নলোকে ফেরি করা কল্পনাগুলো জেগে জেগে ওঠে। কিন্তু অরোরার আঙুলগুলো নিয়ে অরিত্র এত কৌতূহলী হয়ে উঠত না, যদি না স্রষ্টার সুনিপুণ দক্ষতায় গড়া দশটি আঙুলের মধ্যে তার ডানহাতের মধ্যমায় লম্বা করে গভীর এক আঁচড় না থাকত।

অচেনা, অজানা এক নারীর হাতের ক্ষত তাকে এত কৌতূহলী করতে পারে ভেবে অরিত্র নিজের ওপর খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে। তবু বিরক্ত হলেও তার অন্তর্লোক অরোরার আঙুলের এই আঁচড়ের মাঝেই গোপন আর রহস্যময় এক জীবন-ইতিহাস আর স্মৃতিময় কিছুর ইঙ্গিত খুঁজে ফেরে। নস্টালজিয়া কাকে বলে অরোরা তার সংজ্ঞা যেন অরিত্রকে ক্ষণে ক্ষণে শেখায়। ভাগ্যিস অরোরার মতো এক নস্টালজিয়ার ঘোরে সে ডুবে থাকে। না হলে কবে এই চাকরি ছেড়ে সে দেশে পালিয়ে যেত!

অরিত্র কাজের প্রয়োজনে অরোরার অফিসে এলে আনমনে বারবার তার আঙুলের দিকে তাকায়– 'অপেক্ষা' নামের এক বেদনার ভাষাকে শনাক্ত করার জন্য। নিজেকেই তার পাগল মনে হয় আর কৈশোরে দেখা সিনেমার স্রষ্টার সাথে নায়িকাটিকে মনে হয় এক জন্মগত জাত-শিল্পী। তার কিশোর মানসলোকে এই শিল্পীরা এমন এক দৃশ্যকল্প ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তার মনন খুব গভীর আর তীক্ষ্ণভাবে প্রকৃতি আর তার মাঝে একজন নারীর 'অপেক্ষা' করার মানবিক আর্তিকে শনাক্ত করতে শিখেছে তার অজান্তেই। অরিত্রের হৃদয় এখনকার দিনের নাচসর্বস্ব সিনেমা আর শরীর-সর্বস্ব নায়িকাদের (এমনকি নায়কদের) কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সিনেমার প্রসঙ্গ ওঠায় একদিন সে অরোরাকে বলল,

সিনেমার মতো এক মহান শিল্প মাধ্যমকেও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে পৃথিবীর মানুষগুলো কোথায় নামিয়েছে, দেখো। চলচ্চিত্র মানে জীবনের এক চিলতে মুহূর্তকে অমলিন করে রাখা, মানবিক আর্তির চিত্রকে দৃশ্যকল্প দিয়ে হৃদয়ে প্রোথিত করা যেন এক কিশোর সে দৃশ্যকে ভালো বাসতে বাসতে একদিন তার নিজের জীবনকেই ভালোবাসে। তারপর একদিন আকুল মগ্নতায় ভালোবাসতে শিখে তার সেই মানবিক দৃশ্য আর কল্পিত নারীকে।

অরোরা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। যেন প্রত্যুত্তরের কোনো ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর বলল,

কোনো সিনেমা কি তোমাকে এমন কোনো দৃশ্য উপহার দিয়েছে যা ভালোবাসতে-বাসতে তুমি এই জীবনকেই ভালোবাসতে শিখেছ? শিখেছ আকুল মগ্নতায় তোমার প্রিয় নারীকে ভালোবাসতে?

প্রশ্নটা শোনার পর থেকে আনমনা অরিত্রের চোখের সামনে পরিবারের সবাইকে বিদায় দেওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে মায়ের অশ্রুসজল ঝাপসা দৃষ্টির ভিতর দিয়ে এক দৃশ্য ভেসে উঠল-

ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির এক রাত। কিশোর অরিত্রের পড়ার টেবিলের সামনে জানালার পর্দাগুলো উড়ছে পতপত। জানালার অপর প্রান্তে তাদের অন্ধকার বাগানটায় গাছগুলোর পাতা বেয়ে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছেই। বৃষ্টির রাতে এই শীত শীত আবেশ আর নিসঃঙ্গ প্রকৃতি কিশোর অরিত্রের মননে সারাজীবন প্রভাব ফেলেছে। বৃষ্টিমুখর দিন অথবা রাত তাই তার ভাবনালোতে এক রহস্যময়তা।

কিন্তু এই দৃশ্য ছাপিয়ে যা তার স্পষ্ট মনে হলো তা হলো, ঐ কিশোর বয়সে সে কি এক স্বপ্নপরির ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিল। যে পরিটার ডানা সাদা। কল্পলোকের সেই স্বপ্নপরি ঘুমিয়ে গেলে তার স্বপ্ন হয়ে যায়। এক রাতে সেই পরি তার হাত ধরে তাকে তার স্বপ্নঘোরে আকাশের সব প্রান্তে, বৃষ্টি ঝরা নিভৃত পৃথিবীর নিমগ্ন প্রকৃতির অনবদ্যতায় উষ্ণতা খুঁজে বেড়াল। তারপর প্রায়ান্ধকার এক মাচার কাছে এসে অরিত্রের পাশে বসে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে তা দোলাতে দোলাতে শুধু অরিত্রের মুখপানে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। সেই অমলিন হাসি আজো জেগে আছে তার হৃদয়ে। অরিত্র বিমূঢ় ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ অরোরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

হ্যাঁ, আমি সেই পরিটাকে ভালো বাসতে বাসতে এই জীবনকে বড়ো নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছি। অরিত্রের কথায় অরোরা ফিক করে হেসে দিলো–

পরি!

অরোরাকে সে বলতে চাইল, সেই পরিটা ঠিক তোমার মতো।

বলা হলো না। তবে, রাতে বসে বসে সে তার এইসব অনুভূতি নিয়ে ভরিয়ে ফেলল তার দিনলিপির পাতা। কিন্তু এই দিনলিপিতে নতুন এই দেশটির কোনো কথা-ই এলো না। অরিত্র যেন নিজ দেশে, মায়ের কাছে বাস করা এখনো এক কিশোর যে আজো খুঁজে ফিরছে সেই স্বপ্নপরি আর বৃষ্টিমুখরিত দিন অথবা রাতের মাঝে লুকানো রহস্যময়তা।

ইয়ামাসুক্রো নামের বিমানবন্দর হয়ে পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে প্রবেশের দিনে প্রকৃতির মাঝে এমনকি শহর অথবা গঞ্জে, রাস্তার পাশে বসা ক্ষণিক এক বাজারে, আকাশে-বাতাসে, বনের মাঝে মুখ লুকিয়ে থাকা কোনো খাল অথবা নদীতে– সর্বত্র 'নির্জন' আর 'ক্ষণিক' শব্দ দুটি অরিত্রের সমগ্র সত্তা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বাবা-মা'কে খুব মনে পড়ছিল। বিস্তৃত ফাঁকা রাস্তা জুড়ে তাদের বহনকারী কোস্টারটি চলার পথে জনপদ কমই পেল। রাস্তার দুপাশের নির্জন বনানীর ভিতর প্রাচীনত্ব পেরিয়ে দৃষ্টি আটকে যায় দূর আকাশের প্রান্তে। প্রায় মেঘের কাছে ভেসে থাকা সারি সারি পাহাড়ের অসীম নির্জনতায়। কোস্টারের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষগুলোর মুখেও কুলুপ আঁটা। যেন তারা কোনো তীর্থযাত্রী। মেধাবী অথচ নিরীহ ধাঁচের অরিত্র আগ্রহভরে রাস্তার পাশে বসা কাঁচাবাজারে চোখ রেখে প্রাণস্পন্দন ফিরে পেতে চাইলেও তার প্রাণ-পিঞ্জিরায় বেঁধে রাখা এক স্বপ্ন-পাখি যেন পাখা ঝাপটিয়ে উড়তে গিয়েও থেমে গেল। অরিত্র তার হৃৎস্পন্দনের দু-একটা বিট মাঝেমাঝেই হারিয়ে ফেলল।

রাস্তার পাশে বাজারে বিপননের যেসব সামগ্রী তার বেশিরভাগই শিকড়-জাত। অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানের গাছ-ঘাস পুড়িয়ে তারপর পরিষ্কার করে বসা বাজারে মোসাম্বি, কমলা– এই ধরনের লেবুজাতীয় ফলের সাথে দুই/তিন ফুট লম্বা পাউরুটি দেখে অরিত্রের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বাদাম-সিম আর বীজ জাতীয় খাবারের ব্যাপারে এই জাতিটি যে দুর্বল– বাজারে বিক্রির জন্য আনা খাবারগুলোতে দৃষ্টি রেখে তা বোঝা যায়। বাজার করতে আসা নারীদের শরীরে ঝোলানো কোনো নবজাতক, তাদের অনেকেরই প্যাঁচানো কাপড় দিয়ে বুক আর নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। নারীদের পরনের কাপড়ে এমনকি তাদের জীবনাচরণে 'ক্ষণিক' শব্দটির অস্তিত্ব অরিত্রকে পশ্চিম আফ্রিকায় পদার্পণের প্রথম দিনেই অস্থির করে তুলেছিল। বাজারের এই দৃশ্যগুলো অরিত্রকে 'ক্ষণিক' জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। যাত্রারত কোস্টারটিকে তখনই উলটা ঘুরিয়ে নিয়ে তার দেশে

ফিরে যেতে ইচ্ছা করেছিল। ভিতর থেকে কে যেন তাকে প্রশ্ন করেছিল, 'ছোট্ট এই জীবনে তাহলে তোমার প্রিয় চেনা জগত আর বাবা মা-কে কয়দিনই বা পাওয়া হবে?' বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মা'র ক্রন্দনরত দৃষ্টিটা এখনো তার চোখে ভাসছে। 'ভালো চাকরি অথবা ভালো জীবনের নামে অরিত্র 'ক্ষণিক' এই জীবনটাকে অর্থহীন করতে যাচ্ছে তাহলে?' –তার ভিতরে এমন প্রশ্নগুলো আনাগোনা করে।

কিন্তু অরিত্রের এই কষ্টকর অনুভূতিতে ভালো লাগার প্রলেপ হয়ে তাকে এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে টিকে থাকার জন্য প্রেরণা হয়ে প্রথম দিনেই হাজির হয়েছিল অরোরা। কোস্টার থেকে নামার পর অরিত্রকে বহনকারী জিপটা যখন নির্জনতর এক মহাসাগরের লেগুনে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক এক রাজধানীর বুকের যত ভিতরে প্রবেশ করছে অরিত্রের কাছে বহমান এই জনতাকে, আকাশের দিকে মুখ তোলা এই দালান-কোঠা আর তার ফাঁকে ফাঁকে টলটল জলের খালের সাথে সবুজ গাছপালাকে তত অচেনা মনে হচ্ছে। জিপটা একতলা এক ভবনের সামনে থামলে অরিত্রের সামনে এই প্রথম কোনো মানুষ এসে মিষ্টি করে হাসল। সেই মানবী তার হাসির সাথে তার দিকে একগুচ্ছ গোলাপ, অর্কিড আর বিচিত্র বর্ণের সব ফুলের বড়ো তোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল,

স্বাগতম। আমি অরোরা।

অরিত্র ঠিক শুনেছে কি না বুঝল না। অরোরা! মেইলে সে শুধু মি. মাতোমার সাথে যোগাযোগ করেছে। সে ধরেই নিয়েছিল এই দেশটায় আসার পর যার সাথে তার প্রথম দেখা হবে তিনি মি. মাতোমা। সে কি তার সামনে দাঁড়ানো বিষণ্ন আর ভেজা ভেজা পাপড়ি দিয়ে মোড়ানো বিস্ময়কর সৌন্দর্যের কাজল আঁকানো চোখের এই নারীর মুখ থেকে উচ্চারিত 'অরোরা' শব্দটি শুনল? বিমান থেকে নামার পর ভিনগ্রহের এক প্রাণীর মতো তার আত্মা চুপসে গিয়েছিল। কিন্তু তার নামের পাশে খুব যুতসই একটি নাম এই ভিনগ্রহে এসে শোনার পর তার চুপসে থাকা আত্মা কৌতূহল মুখরিত হয়ে উঠল। সে তার স্বভাবজাত নিরীহ মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে কৃতজ্ঞতাভরে ফুলের তোড়া গ্রহণ করে বলল,

ধন্যবাদ ম্যাম। আমি অরিত্র, অর্থ সম্পদ বিভাগে... অরোরা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল,

ইয়াহ, আই নো। আমার পাশের অফিসটাতে তুমি বসবে। গ্লাড টু গেট ইউ ইন মাইন ডিপার্টমেন্ট। অরোরা তাকে তার আবাসস্থল দেখিয়ে, তার ঘরে নিয়ে গিয়ে অরিত্রকে একটা ল্যান্ডফোন দেখিয়ে বলল,

হ্যান্ডসেটে আমাদের বিভাগের সকলের ফোন নাম্বার সেঁটে দেওয়া আছে। তুমি ফ্রেশ হয়ে আমাকে ফোন করো। মি. মাতোমা একজন রাষ্ট্রদূতের নিমন্ত্রণে আছেন। সুতরাং আমরা দুজন একসাথে ডিনার করব।

একই ধাঁচে গড়া পাশের আবাসস্থলটিতে অরোরা বাস করে। কিন্তু অরোরার আবাসটা আটলান্টিকের লেগুনের সাথে লাগোয়া। অরিত্রের মনে হলো, যে কারণে অরোরার আবাসটি অনন্য তা হলো তার ছাদ ঘর। বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে অরোরা অরিত্রকে নিয়ে তার ছাদ ঘরে গিয়ে বসল। এখানেই ডিনারের জন্য পরিচারক টেবিলে বিভিন্ন পদের খাবার সাজিয়েছে। মৃদু আলোয় খাবার টেবিলে দুজন মুখোমুখি বসলেও অরিত্র কেন যেন অরোরার কাজল আঁকানো চোখ দুটির নিরীহ মায়ায় তাকাতে গিয়ে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলো। অরোরার শরীরে প্রাচ্যের পোশাক। কিছুটা রক্ষণশীল এই পোশাকের জন্যই অরোরাকে তার খুব চেনা মনে হয়েও তার পাশ্চাত্যের ধাঁচের শারীরিক গড়নের কারণে সাথে সাথে আবার তাকে অচেনা মনে হচ্ছে।

চেনা-অচেনার ঘোর না কাটতেই সাগর ঢেউয়ের গর্জন তার কাছে নতুন নস্টালজিয়া হয়ে অরিত্রকে আনমনা করে ফেলল। তার মনে হলো, সে যেন এক স্বপ্ন দেখছে। কৈশোরে স্বপ্নে দেখা সেই পরি আজ তাকে এমন এক স্থানে এনেছে যার অস্তিত্ব বাস্তব পৃথিবীতে হয়তো নেই। এই মায়াবী আলোর নিচে, উঁচুতে সুরক্ষিত কোনো স্থান থেকে এভাবে এক মহাসাগরের অবারিত জলরাশির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার ফেনিল গর্জনের মাঝে সারারাত কাটিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন-কল্পনায় সে ভেসেছে। আর তার কৈশোর-স্বপ্নে দেখা পরিসহ সেই কল্পনা এত বাস্তব হয়ে তাকে স্বপ্নাচ্ছন্নতায় ডুবিয়ে দিয়েছে যে, অরিত্রের বারবার এটাকেও এক স্বপ্ন বলে ভুল হচ্ছিল। তাই সে সন্তর্পণে অরোরার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল যেন তার দিকে ভালো করে তাকালেই সে হারিয়ে যাবে!

প্রথম রাতে যাত্রাক্লান্ত অরিত্রের সাথে খাবারের বাইরে শুধু তাদের ব্যক্তিগত আর পারিবারিক পরিচয় পর্ব সমাপ্তি শেষে অরোরা বলল,

আজ লম্বা একটা ঘুম দাও। কাল আটটা ত্রিশে তোমাকে নিয়ে অফিসের উদ্দেশে বের হব। আগামীকাল তোমাকে অফিসের কাজের পরিবেশ, ধরন আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও স্টাফদের সাথে পরিচয় করানো আমার দায়িত্ব।

অরোরার কথা শুনে অরিত্র ভিতর থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এই অচেনা পরিবেশে একদল প্রতিভাধর মানুষদের সামনে তার সাথে খুব

অচেনা তবু কেন যেন খুব চেনা অরোরা থাকবে ভাবতেই এই স্বস্তিবোধ। সে তার ভিতরের অনুভূতির কিছুই প্রকাশ না করলেও তার কৃতজ্ঞতায় ভরা দু চোখের ভাষা অরোরা পড়ে ফেলল। অরিত্র তাকে প্রায় অস্ফুট স্বরে শুধু বলল,

ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ...

নতুন কাজের পরিবেশ আর এতগুলো নতুন মুখকে সামলানোর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সারারাত অরিত্র প্রায় ঘুমাতে পারল না। সকালে অরোরার এসে পৌঁছানোর এক ঘণ্টা আগেই সে সাদা-কালো ডোরার শার্ট, কালো প্যান্ট-বেল্ট আর পালিশ করা কালো জুতা পরে বসে ছিল। অরোরা জিপ চালিয়ে তাকে তার পাশের আসনে বসিয়ে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,

কী হয়েছে অরিত্র? এনি ব্যাড নিউজ? অরিত্র দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার ভঙ্গিতে বলল,

ন... নো। ইটস ওকে।

সারারাত মনে হয় ঘুমুতে পারোনি। চোখের কোণে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে...

আসলে প্রথম দেশের বাইরে এসেছি তো! কথাটা বলামাত্র অরিত্রের হার্টের একটা স্পন্দন যেন হারিয়ে গেল। তার মনে হলো, নতুন এই কর্মস্থলের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে দেশে ফিরে গেলেই ভালো হয়। অরোরা এমন শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলা এত নিরীহ তরুণ কোনোদিন দেখেনি। যে বলার চেয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। অরোরা অফিসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য খেয়াল করল। অরিত্র তার কথা শোনার সময় চোখের অক্ষিগোলককে চোখের এক কোণে নিয়ে এমন করে তাকায় যা তার নিরীহ আর নির্মলতার প্রতি যে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করে। অরিত্রের এমন আবিষ্ট হয়ে কথা শোনার ধরনে অরোরার কিসের যেন এক মায়া জন্মাল।

অরোরাই তার পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তা - অফিসে গিয়ে এই তথ্য জানার পর অরিত্র আনন্দিত হয়ে উঠল। আর এই ভেবে অবাক হলো যে, সেই অরোরাই তাকে আপ্যায়নই শুধু নয় তার কাজগুলো নিঁখুতভাবে বুঝতে সাহায্য করছে। এরপর নয়টা-পাঁচটা অফিসের কাজের পরম্পরা নিয়ে সংস্থাটিতে নতুন আগত অফিসারদের সাথে প্রশিক্ষণ নিতে নিতে কখন কেটে গেল একটা সপ্তাহ। অরোরা এমন এক প্রশিক্ষণার্থীকে পেল যে তার প্রশিক্ষকের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এক সপ্তাহ পর

একটা কাজের আবর্তে ফেলে অরিত্রের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মান যাচাই করার পর অরোরা বলল,

প্রতিভাবানদের চোখে এক ধরনের বিনয় থাকে। নিজেকে প্রকাশে অথবা তাদের অভিব্যক্তিতে তারা নীরবতা ধারন করে রাখে সেই বিনয়টুকুকে হয়তো হারিয়ে না ফেলার জন্য। ইউ আর রিয়েলি ট্যালেন্ট! ইউ ডিড দ্য বেস্ট।

এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করায় প্রশিক্ষক খুশি হয়ে তার প্রশিক্ষণার্থীকে পুনরায় নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করল। অরোরা মনে মনে পরিকল্পনা করল, তার ছাদ ঘরে নৈশভোজের সময় সে আজ অরিত্রকে অনেক কথা বলিয়ে নিবে। যেন প্রতিভাবান এই তরুণ তার সাথে বলায় এবং চলায় আরো সহজ হয়। তার সাথে আড্ডায় অথবা কথা বলায় হয়ে ওঠে অবারিত।

সন্ধ্যার পর অরিত্র অরোরার ছাদ ঘরে এলো। আজ এখানে কোনো কৃত্রিম আলো নেই। অরোরা এসে বাতিগুলো জ্বালাল না। অরিত্রকে সাগরের দিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে সেখানে বসতে বলে নিজেও তার পাশের চেয়ারে বসল। অরিত্র জোছনায় ভেসে যাওয়া আটলান্টিকের জলতরঙ্গের দিকে এত বুঁদ হয়ে তাকিয়ে থাকল যে সে ভুলেই গেল, তার পাশে অরোরা নামের এক নারী বসে আছে যার জন্য যেকোনো তরুণ এই সাগর তরঙ্গের মতো এত উতলা হতে পারে। অরোরা নামের কোনো দেবীর ইশারায় চাঁদের রূপালি আস্তরণ বুকে মেখে গর্জনরত এই ঢেউগুলো একে অন্যকে অতিক্রমের খেলায় আজ এত আস্তরিত। আকাশ আর এক মহাসাগরের সাথে চাঁদের এই রহস্যময় কথোপকথনের মাঝে অরিত্র নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। তাকে ওমন মগ্ন হয়ে সাগরপানে তাকিয়ে থাকতে দেখে অরোরা বলল,

মনে হচ্ছে, তুমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল। কিন্তু প্রকৃতি বলতে শুধু সাগর জলের সাথে জোছনার মাখামাখিকেই বোঝায় না, প্রকৃতির মাঝে যে নারী থাকে সে-ই আসলে প্রকৃতির বড়ো একটা অংশ। আর নারীটা সুন্দরী হলে প্রকৃতি হয়ে ওঠে আরো রহস্যময়, বুঝেছ বুদ্ধু!

অরিত্র লাজুক হয়ে উঠল। এমন কথার প্রত্যুত্তর কী হতে পারে তা খুঁজে না পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভঙ্গিতে আবছা আলোয় তবু স্পষ্ট অরোরার চোখের দিকে সে তাকিয়ে থাকল। ভাগ্যিস এখানে আধো আলো-অন্ধকার! না হলে অরোরার বিষণ্ন আর ভেজা ভেজা পাপড়ি দিয়ে মোড়ানো বিস্ময়কর

সৌন্দর্যের কাজল আঁকানো চোখ দুটিতে সে হয়তো এতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারত না। সে ভাবছিল, অরোরা কী করে এত নিঁখুতভাবে তার মনের ভিতরের অনুভূতিটাকে ধরতে পেরেছে? নাকি সব নারীই এমন? প্রকৃতির মতো নৈসর্গিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভাষাহীন অরিত্রের মুখে ভাষাকে প্রবাহমান করতেই অরোরা বলল,

কী ভাবছিলে?

অরোরার প্রশ্ন অরিত্রকে সত্যিই শুধু স্বাভাবিকই করল না, তার ভাবনাকে প্রকাশের জন্য প্রেরণাও জোগাল। কিন্তু সে নিজেকে লুকাতেই বলল,

ভাবছিলাম, মহাবিশ্বে স্থল আর জলের পরিধি বদলে গেলেও মহাকাল এভাবেই চাঁদের আলো নিয়ে এই সাগরজলে খেলতেই থাকবে, অনাদিকাল ধরে -তার রহস্যময় খেলা!

অরোরা অরিত্রের কথায় এবার ভাষা হারিয়ে ফেলল। অরিত্রের এই কথাগুলো কেন যেন তাকে আনমনা করে ফেলল। তার অতীত জীবনের ভয়াবহ এক স্মৃতি ভিতরে ভিতরে তাকে অস্থির করে তুলল। নিজেকে শান্ত করার পথ হিসেবে সে অরিত্রের কাছ থেকে এমন নৈসর্গিক কথা আরো শুনতে চাইল। তাকে সে প্রশ্ন করল,

আর কী ভাবছিলে? অরোরার প্রশ্নে দীর্ঘ এক শ্বাস নিয়ে অরিত্র বলল,

এই প্রকৃতি আমাকে বলছিল, শুধু পয়সা উপার্জন, ক্ষমতার জন্য ছুটে চলা অথবা জৈবিক আর জাগতিক চাহিদার কাছে জীবনকে সঁপে দেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। স্রষ্টা মানুষকে আর তার মননকে মহাকালের মাঝে লুকানো সব রহস্যময়তা দিয়ে অনন্য করে সৃষ্টি করেছেন এইজন্য যে, মানুষ প্রাণীগুলো যেন তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে উপলব্ধি করে, স্রষ্টা কী অনন্য নৈসর্গিক ক্ষমতার এক মহিমান্বিত জীবন তাকে দান করেছেন!

বাহ, তুমি এত সুন্দর করে অনুভব করো, অরিত্র! কিন্তু দেখো এই আমরা, এই পদ-পদবি, অর্থ আর ক্ষমতার কাছে হন্যে হয়ে ছুটতে গিয়ে জীবনের এই ‘প্রেরণা’ নামের নিগূঢ় আনন্দটুকু পায়ে ঠেলি।

ইয়েস ম্যাম, প্রেরণার এই পালে ভর করেছিলেন বলে আইনস্টাইন $E= MC^2$, নিউটন গতিবিদ্যার সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন অথবা মার্কেজ ‘শত বছরের নির্জনতা’ নামের উপন্যাসের সৃষ্টি করেছিলেন। আমার বিবেচনায়, সৃজনীশক্তির অধিকারী প্রতিভাবান মানুষ তারাই যাদের নাম মনে হওয়ামাত্র সাথে সাথে তাদের কোনো এক মহান কর্মের কথা মনে পড়ে।